অচলায়তন

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA

১

অচলায়তনের গৃহ

পঞ্চক

পঞ্চক। গান

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ তো টানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! আবার গান!

পঞ্চক। দাদা, তুমি তো দেখলে—তোমাদের এখানকার মন্ত্রতন্ত্র আচার-আচমন সূত্র-বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক। সে তো দেখতে বাকি নেই—কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?

পঞ্চক। একমাত্র ওইটেই যে পারি।

মহাপঞ্চক। পারি! ভারি অহংকার। গান তো পাখিও গাইতে পারে। সেই যে বজ্রবিদারণ মন্ত্রটা আজ সাত দিন ধরে তোমার মুখস্থ হল না আজ তার কী করলে ?

পঞ্চক। সাত দিন যেমন হয়েছে অষ্টম দিনেও অনেকটা সেইরকম। বরঞ্চ একটু খারাপ।

মহাপঞ্চক। খারাপ! তার মানে কী হল।

পঞ্চক। জিনিসটা যতই পুরোনো হচ্ছে মন ততই লাগছে না, ভুল ততই করছি—ভুল যতই বেশিবার করছি ততই সেইটেই পাকা হয়ে যাচ্ছে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্ছি দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাত হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।

মহাপঞ্চক। সেই তফাতটা ঘোচাতে হবে, নির্বোধ।

পঞ্চক। সহজেই ঘোচে, যদি তোমাদেরটাকেই আমার মতো করে নাও! নইলে, আমি তো পারব না।

মহাপঞ্চক। পারবে না কী। পারতেই হবে।

পঞ্চক। তাহলে আর-একবার সেই গোড়া থেকে চেষ্টা করে দেখি—একবার মন্ত্রটা আউড়ে দিয়ে যাও।

মহাপঞ্চক। আচ্ছা, বেশ, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে যাও। ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর বসত্ত্বানি। চুপ করে রইলে যে!

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—আচ্ছা দাদা।

মহাপঞ্চক। আবার দাদা! মন্ত্রটা শেষ করো বলছি।

পঞ্চক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এ মন্ত্রটার ফল কী।

মহাপঞ্চক। এ মন্ত্র প্রত্যহ সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে উনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়।

পঞ্চক। রক্ষা করো দাদা। এটা জপ করতে গিয়ে আমার একবেলাকেই নব্বই বছর মনে হয়—দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেছি।

মহাপঞ্চক। আমার ভাই হয়েও তোমার এই দশা! তোমার জন্যে আমাদের এই অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজ্জা।

পঞ্চক। লজ্জার তো কোনো কারণ নেই দাদা।

মহাপঞ্চক। কারণ নেই?

পঞ্চক। না। তোমার পাণ্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য হয় তুমি আমারই দাদা বলে।

মহাপঞ্চক। এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত। দেখো পঞ্চক তুমি তো আর বালক নও—তোমার এখন বিচার করে দেখবার বয়স হয়েছে।

পঞ্চক। তাই তো বিপদে পড়েছি। আমি যা বিচার করি তোমাদের বিচার একেবারে তার উলটো দিকে চলে, অথচ তার জন্যে যা দণ্ড সে আমাকে একলাই ভোগ করতে হয়।

মহাপঞ্চক। পিতার মৃত্যুর পর কী দরিদ্র হয়ে, সকলের কী অবজ্ঞা নিয়েই এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিলুম, আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে কত উপরে উঠেছি, আমার এই দৃষ্টান্তও কি তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না।

পঞ্চক। সচেষ্ট করবার তো কথা নয়। তুমি যে নিজগুণেই দৃষ্টান্ত হয়ে বসে আছ, ওর মধ্যে আমার চেষ্টার তো কিছু মাত্র দরকার হয় না। তাই নিশ্চিন্ত আছি।

মহাপঞ্চক। ওই শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকাগাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি সময় নষ্ট ক'রো না। প্রস্থান

পঞ্চক। গান

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো আনে না।
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না।

ছাত্রদলের প্রবেশ

প্রথম ছাত্র। ওহে পঞ্চক।

পঞ্চক। না ভাই, আমাকে বিরক্ত ক'রো না।

দ্বিতীয় ছাত্র। কেন। হল কী তোমার।

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় ছাত্র। এখনও তট তট তোতয় তোতয় ঘুচল না? ও যে আমাদের কোন্‌কালে শেষ হয়ে গেছে তা মনেও আনতে পারিনে।

প্রথম ছাত্র। না ভাই, পঞ্চককে একটু পড়তে দাও; নইলে ওর কী গতি হবে। এখনও ও বেচারা তট তট করে মরছে—আমাদের যে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে!

দ্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা পঞ্চক, এখনও তুমি চক্রেশমন্ত্র শেখনি?

পঞ্চক। না।

তৃতীয় ছাত্র। মরীচি ?

পঞ্চক। না।

প্রথম ছাত্র। মহামরীচি ?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয় ছাত্র। পর্ণশবরী ?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা বলো দেখি হরেত পক্ষীর নখাগ্রে যে-পরিমাণ ধূলিকণা লাগে সেই পরিমাণ যদি—

পঞ্চক। আরে ভাই হরেত পক্ষীই কোনোজন্মে দেখিনি তো তার নখাগ্রের ধূলিকণা।

প্রথম ছাত্র। হরেত পক্ষী তো আমরাও কেউ দেখিনি—শুনেছি সে দধিসমুদ্রের পারে মহাজম্বুদ্বীপে বাস করে—কিন্তু এ-সমস্ত তো জানা চাই, নিতান্ত মূর্খ হয়ে জীবনটাকে মাটি করলে তো চলবে না।

দ্বিতীয় ছাত্র। পঞ্চক, তুমি আর বৃথা সময় নষ্ট ক'রো না। তোমার কাছে তো কেউ বেশি আশা করে না। অন্তত শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চুপরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন—এগুলো তো জানা চাইই—নইলে তুমি অচলায়তনের ছাত্র বলে লোকসমাজে পরিচয় দেবে কোন্ লজ্জায় ?

তৃতীয় ছাত্র। চলো বিশ্বম্ভর। আমরা যাই, ও একটু পড়ুক।

[গমনোদ্যত

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর। তট তট তোতয় তোতয়—

বিশ্বম্ভর। কেন ? আবার ডাক কেন ?

পঞ্চক। সঞ্জীব, জয়োত্তম। তট তট তোতয় তোতয়—

সঞ্জীব। কী হয়েছে। পড়ো না।

পঞ্চক। দোহাই তোমাদের, একেবারে চলে যেয়ো না। ওই শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান জীবের মুখ দেখলে তবু আশ্বাস হয় যে জগৎটা বিধাতা পুরুষের প্রলাপ নয়।

জয়োত্তম। না হে, মহাপঞ্চক বড়ো রাগ করেন। তিনি মনে করেন, তোমার যে কিছু হচ্ছে না তার কারণ আমরা।

পঞ্চক। আমি যে কারও কোনো সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজগুণেই অকৃতার্থ হতে পারি দাদা আমার এটুকু ক্ষমতাও স্বীকার করেন না এতেই আমি বড়ো দুঃখিত হই। আচ্ছা ভাই তোমরা ওইখানে একটু তফাতে বসে কথাবার্তা কও। যদি দেখ একটু অন্যমনস্ক হয়েছি আমাকে সতর্ক করে দিয়ো। স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়—

জয়োত্তম। আচ্ছা বেশ, এইখানে আমরা বসছি।

সঞ্জীব। বিশ্বম্ভর, তুমি যে বললে এবার আমাদের আয়তনে গুরু আসবেন সেটা শুনলে কার কাছ থেকে?

বিশ্বম্ভর। কী জানি, কারা সব বলাকওয়া করছিল। কেমন করে চারিদিকেই রটে গিয়েছে যে চাতুর্মাস্যের সময় গুরু আসবেন।

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর, বল কী? আমাদের গুরু আসবেন নাকি?

সঞ্জীব। আবার পঞ্চক! তোমার কাজ তুমি করো না!

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। কিন্তু অধ্যাপকদের কারও কাছে শুনেছ কি? মহাপঞ্চক কী বলেন?

বিশ্বম্ভর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। মহাপঞ্চক কারও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। আজকাল তিনি আর্যঅষ্টোত্তরশত নিয়ে পড়েছেন—তাঁর কাছে ঘেঁষে কে।

পঞ্চক। চলো না ভাই, আচার্যদেবের কাছে যাই—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই—

জয়োত্তম। আবার! ফের!

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আমার তো উনিশ বছর বয়স হল—এর মধ্যে একবারও আমাদের গুরু এ আয়তনে আসেননি। আজ তিনি হঠাৎ আসতে যাবেন এটা বিশ্বাস করতে পারিনে।

সঞ্জীব। তোমার তর্কটা কেমনতরো হল হে, জয়োত্তম? উনিশ বছর আসেননি বলে বিশ বছরে আসাটা অসম্ভব হল কোন্ যুক্তিতে?

বিশ্বম্ভর। তাহলে অঙ্কশাস্ত্রটাই অপ্রমাণ হয়ে যায়! তবে তো উনিশ পর্যন্ত বিশ নেই বলে উনিশের পরেও বিশ থাকতে পারে না।

সঞ্জীব। শুধু অঙ্ক কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও টেঁকে না। কারণ যা এ-মুহূর্তে ঘটেনি তা ও-মুহূর্তেই বা ঘটে কী করে?

জয়োত্তম। আরে। ওইটেই তো আমার তর্ক। কে বললে ঘটে? যা পূর্বে ঘটেনি তা কিছুতেই পরে ঘটতে পারে না। আচ্ছা, এসো, কিছু যে ঘটে সেইটে প্রমাণ করে দাও।

পঞ্চক। (জয়োত্তমের কাঁধে চড়িয়া) প্রমাণ? এই দেখো প্রমাণ। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আঃ পঞ্চক! কর কী। নাবো বলছি। আঃ নাবো।

পঞ্চক। আমি যে তোমার কাঁধে চড়েছি সেটা প্রমাণ না করে দিলে আমি কিছুতেই নাবছিনে। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক। তুমি বড়ো উৎপাত করছ।

পঞ্চক। দাদা, এরাই গোল করছিল। আমি আরও থামিয়ে দেবার জন্যেই এসেছি। তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট—

মহাপঞ্চক। তোমার নিজের কাজ অবহেলা করবার একটা উপলক্ষ্য জুটলেই তোমাকে সংবরণ করা অসম্ভব।

বিশ্বম্ভর। দেখুন, একটা জনশ্রুতি শুনতে পাচ্ছি, বর্ষার আরম্ভে আমাদের গুরু নাকি এখানে আসবেন।

মহাপঞ্চক। আসবেন কিনা তা নিয়ে আন্দোলন না করে যদিই আসেন তার জন্যে প্রস্তুত হও।

পঞ্চক। তিনি যদি আসেন তিনিই প্রস্তুত হবেন। এদিক থেকে আবার আমরাও প্রস্তুত হতে গেলে হয়তো মিথ্যে একটা গোলমাল হবে।

মহাপঞ্চক। ভারি বুদ্ধিমানের মতোই কথা বললে।

পঞ্চক। অন্নের গ্রাস যখন মুখের কাছে এগোয় তখন মুখ স্থির হয়ে সেটা গ্রহণ করে—এ তো সোজা কথা। আমার ভয় হয় গুরু এসে হয়তো দেখবেন আমরা যেদিক দিয়ে প্রস্তুত হতে গিয়েছি সেদিকটা উলটো। সেইজন্যে আমি কিছু করিনে।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, আবার তর্ক ?

পঞ্চক। তর্ক করতে পারিনে বলে রাগ কর, আবার দেখি পারলেও রাগ ?

মহাপঞ্চক। যাও তুমি।

পঞ্চক। যাচ্ছি, কিন্তু বলো না গুরু কি সত্যই আসবেন ?

মহাপঞ্চক। তাঁর সময় হলেই তিনি আসবেন। প্রস্থান

সঞ্জীব। মহাপঞ্চক কোনো কথার শেষ উত্তর দিয়েছেন এমন কখনোই শুনিনি।

জয়োত্তম। কোনো কথার শেষ উত্তর নেই বলেই দেন না। মূর্খ যারা তারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যারা অল্প জানে তারাই জবাব দেয়, আর যারা বেশি জানে তারা জানে যে জবাব দেওয়া যায় না।

পঞ্চক। সেইজন্যেই উপাধ্যায়মশায় যখন শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করেন তোমরা জবাব দাও কিন্তু আমি একেবারে মূক হয়ে থাকি।

জয়োত্তম। কিন্তু প্রশ্ন না করতেই যে কথাগুলো বল, তাতেই—

পঞ্চক। হাঁ, তাতেই আমার খ্যাতি রটে গেছে, নইলে কেউ আমাকে চিনতেই পারত না।

বিশ্বম্ভর। দেখো পঞ্চক, যদি গুরু আসেন তাহলে তোমার জন্যে আমাদের সকলকেই লজ্জা পেতে হবে।

সঞ্জীব। আটান্ন প্রকার আচমনবিধির মধ্যে পঞ্চক বড়োজোর পাঁচটা প্রকরণ এতদিনে শিখেছে।

পঞ্চক। সঞ্জীব, আমার মনে আঘাত দিয়ো না। অত্যুক্তি করছ।

সঞ্জীব। অত্যুক্তি!

পঞ্চক। অত্যুক্তি নয় তো কী। তুমি বলছ পাঁচটা শিখেছি। আমি দুটোর বেশি একটাও শিখিনি। তৃতীয় প্রকরণে মধ্যমাঙ্গুলির কোন্ পর্বটা কতবার কতখানি জলে ডুবোতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে অন্য আঙুলের অস্তিত্বই ভুলে যাই। কেবল একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা আমার খুব অভ্যাস হয়ে গেছে। হাসছ কেন? বিশ্বাস করছ না বুঝি?

জয়োত্তম। বিশ্বাস করা শক্ত।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় যখন পরীক্ষা করতে এলেন তখন

তাঁকে ওই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত দেখিয়ে বিস্মিত করবার চেষ্টায় ছিলুম কিন্তু তিনি চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুললেন, আমার আর এগোল না।

বিশ্বম্ভর। না, পঞ্চক, এবার গুরু আসার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।

পঞ্চক। পঞ্চক পৃথিবীতে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে জন্মেছে তেমনি অপ্রস্তুত হয়েই মরবে। ওর ওই একটি মহদ্‌গুণ আছে, ওর কখনো বদল হয় না।

সঞ্জীব। তোমার সেই গুণে উপাধ্যায়মশায়কে যে মুগ্ধ করতে পেরেছ তা তো বোধ হয় না।

পঞ্চক। আমি তাঁকে কত বোঝাবার চেষ্টা করি যে বিদ্যাসম্বন্ধে আমার একটুও নড়চড় নেই—ওই যাকে বলে ধ্রুবনক্ষত্র—তাতে সুবিধা এই যে এখানকার ছাত্ররা কে কতদূর এগোল তা আমার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

জয়োত্তম। তোমার আশ্চর্য এই সুযুক্তিতে উপাধ্যায়মশায়ের বোধ হয়—

পঞ্চক। না, কিছু না—তাঁর মনে কিছুমাত্র বিকার ঘটল না। আমার সম্বন্ধে পূর্বে তাঁর যে-ধারণা ছিল সেইটেই দেখলুম আরও পাকা হল।

সঞ্জীব। আমরা যদি উপাধ্যায়মশায়কে তোমার মতন অমন যা-তা বলতুম তাহলে রক্ষা থাকত না। কিন্তু পঞ্চকের বেলায়—

পঞ্চক। তার মানে আছে। কুতর্কটা আমার পক্ষে এমনি সুন্দর স্বাভাবিক যে সেটা আমার মুখে ভারি মিষ্ট শোনায়। সকলেই খুশি হয়ে বলে, ঠিক হয়েছে, পঞ্চকের মতোই কথা হয়েছে। কিন্তু ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয় না দিতে পারলে তোমাদের আদর নেই। এমনি তোমরা হতভাগ্য।

জয়োত্তম। যাও ভাই পঞ্চক, আর ব'কো না। আমরা চললুম। তুমি একটু মন দিয়ে পড়ো। তিনজনের প্রস্থান

পঞ্চক। হবে না, আমার কিছুই হবে না। এখানকার একটা মন্ত্রও আমার খাটল না।

গান

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির স্থরে স্থরে।
যে-পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে,
সে-পথ বেয়ে কাঙাল পরান
যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে।

ও কী ও! কান্না শুনি যে। এ নিশ্চয়ই স্থভদ্র। আমাদের এই আয়তনে ওর চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারিনে। প্রস্থান

বালক স্থভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল্—কী হয়েছে বল্।

স্থভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস? কী পাপ?

স্থভদ্র। সে আমি বলতে পারব না! ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে।

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল্।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের ?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কী করলি ?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস ? শুনে লোভ হচ্ছে যে।

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না—একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে ?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে ;—আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তাহলে তার বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত—আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারিনি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম বালক। অ্যাঁ, সুভদ্র। তুমি বুঝি এখানে।

দ্বিতীয় বালক। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে।

পঞ্চক। চুপ চুপ। ভয় নেই সুভদ্র, কাঁদছিস কেন ভাই। প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম বালক। (চুপি চুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অমন সাহস আছে ?

দ্বিতীয় বালক। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

তৃতীয় বালক। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহলে যে সে—

পঞ্চক। তাহলে কী।

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক শুনিই না।

তৃতীয় বালক। জানিনে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে।

পঞ্চক। শোন্ বলি সুভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানিনে —কিন্তু যাই হ'ক না, আমি তাতে একটুও ভয় করিনে।

সুভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ।

পঞ্চক। দেখেছি বই কি। ওমাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে তার উপর পাঁচটা শেয়াল-কাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ। কী ভয়ানক। আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল।

পঞ্চক। তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারেনি।

প্রথম বালক। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয় বালক। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তাঁর রাগটা কী রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ-কাজ করেছি।

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত।

পঞ্চক। তাহলে এ সম্বন্ধে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।

প্রথম বালক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের উত্তর দিকের জানলাটা—

পঞ্চক। সেটাও আমাকে একবার খুলে দেখতে হবে স্থির করেছি।

সুভদ্র। তুমিও খুলে দেখবে?

পঞ্চক। হাঁ ভাই সুভদ্র, তাহলে তুই তোর দলের একজন পাবি।

প্রথম বালক। না পঞ্চকদাদা, পায়ে পড়ি পঞ্চকদাদা, তুমি—

পঞ্চক। কেন রে, তোদের তাতে ভয় কী।

দ্বিতীয় বালক। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। ভয়ানক না হলে মজা কিসের।

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক পাপ।

প্রথম বালক। মহাপঞ্চকদাদা আমাদের বলে দিয়েছেন, ওতে মাতৃহত্যার পাপ হয়। কেননা, উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

পঞ্চক। মাতৃহত্যা করলুম না অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করলুম সেই মজাটা কী রকম, দেখতে আমার ভয়ানক কৌতূহল।

প্রথম বালক। তোমার ভয় করবে না?

পঞ্চক। কিছু না। ভাই সুভদ্র তুই কী দেখলি বল্ দেখি।

দ্বিতীয় বালক। না, না, বলিসনে।

তৃতীয় বালক। না, সে আমরা শুনতে পারব না—কী ভয়ানক।

প্রথম বালক। আচ্ছা, একটু, খুব একটুখানি বল্ ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা, না না, আর শুনব না। আর ব'লো না সুভদ্র। ওই যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল্ চল্—আর না।

পঞ্চক। কেন। এখন তোমাদের কী।

প্রথম বালক। বেশ, তাও জান না বুঝি। আজ যে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তাতে কী।

দ্বিতীয় বালক। আজ কাকিনী সরোবরের নৈর্ঋত কোণে ঢোঁড়াসাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেন রে।

প্রথম বালক। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা! সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয় বালক। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম বালক। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য।

বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

উপাধ্যায়। পঞ্চককে শিশুদের দলেই প্রায় দেখতে পাই।

পঞ্চক। এই আয়তনে ওদের সঙ্গেই আমার বুদ্ধির একটু মিল হয়। ওরা একটু বড়ো হলেই আর তখন—

উপাধ্যায়। কিন্তু তোমার সংসর্গে যে ওরা অসংযত হয়ে উঠছে। সেদিন পটুবর্ম আমার কাছে এসে নালিশ করেছে শুক্রবারের প্রথম প্রহরেই উপতিষ্য তার গায়ের উপর হাই তুলে দিয়েছে।

পঞ্চক। তা দিয়েছে বটে, আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

উপাধ্যায়। সে আমি অনুমানেই বুঝেছি নইলে এতবড়ো আয়ুক্ষয়কর অনিয়মটা ঘটবে কেন। শুনেছি তুমি নাকি সকলের সাহস বাড়িয়ে দেবার জন্য পটুবর্মকে ডেকে তোমার গায়ের উপর এক-শ বার হাই তুলতে বলেছিলে?

পঞ্চক। আপনি ভুল শুনেছেন।

উপাধ্যায়। ভুল শুনেছি?

পঞ্চক। একলা পটুবর্মকে নয় সেখানে যত ছেলে ছিল প্রত্যেককেই আমার গায়ের উপর অন্তত দশটা করে হাই তুলে যাবার জন্যে ডেকেছিলুম—পক্ষপাত করিনি।

উপাধ্যায়। প্রত্যেককেই ডেকেছিলে?

পঞ্চক। প্রত্যকেকেই। আপনি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে জানবেন। কেউ সাহস করে এগোল না। তারা হিসাব করে দেখলে পনেরো জন ছেলেতে মিলে দেড়-শ হাই তুললে তাতে আমার সমস্ত আয়ু ক্ষয় হয়ে গিয়েও আরও অনেকটা বাকি থাকে, সেই উদ্বৃত্তটাকে নিয়ে যে কী হবে তাই স্থির করতে না পেরে তারা মহাপঞ্চকদাদাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গেল, তাতেই তো আমি ধরা পড়ে গেছি।

উপাধ্যায়। দেখো, তুমি মহাপঞ্চকের ভাই বলে এতদিন অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর চলবে না। আমাদের গুরু আসছেন শুনেছ?

পঞ্চক। গুরু আসছেন? নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছেন?

উপাধ্যায়। হাঁ। কিন্তু এতে তোমার উৎসাহের তো কোনো কারণ নেই।

পঞ্চক। আমারই তো গুরুর দরকার বেশি, আমার যে কিছুই শেখা হয়নি।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়।

পঞ্চক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনছি এখন বিরক্ত করিসনে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন। সুভদ্র শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তাহলে বসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেওয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কুনুই ঠেকিয়েছ। তাহলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ওই জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমি-কুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখিনে। কুলদত্তের ক্রিয়া-সংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে।

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র যাও তুমি।—কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি—

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগ-প্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে—তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায় আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার। সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর্।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটিনি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ। করেছিস কী। আজ তিন-শ পঁয়তাল্লিশ বছর ওই জানলা কেউ খোলেনি তা জানিস?

সুভদ্র। আমার কী হবে।

পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিন-শ পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মুখে আর কথা নেই।

সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানিনে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী। বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই আচার্যদেবকে জানাই গে।

প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব।

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন।

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি—কোনো ত্রুটি ঘটেনি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়।

আচার্য। না আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন।

আচার্য। দ্বিধা? তা দ্বিধা হচ্ছে সে-কথা স্বীকার করি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) দেখো সূতসোম, অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠছে, কাউকে বলতে পারছিনে। আমি এই আয়তনের আচার্য; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তখন একলা চুপ করে বহন করতে হয়। এতদিন তাই বহন করে এসেছি। কিন্তু যেদিন পত্র পেয়েছি গুরু আসছেন সেই দিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছিনে। সে কেবলই আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠছে—বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা!

উপাচার্য। আচার্যদেব, বলেন কী। বৃথা, সমস্তই বৃথা?

আচার্য। সুতসোম, আমরা এখানে কতদিন হল এসেছি মনে পড়ে কি। কত বছর হবে?

উপাচার্য। সময় ঠিক করে বলা বড়ো কঠিন। এখানে মনের পক্ষে প্রাচীন হয়ে উঠতে বয়সের দরকার হয় না। আমার তো মনে হয় আমি জন্মের বহু পূর্ব হতেই এখানে স্থির হয়ে বসে আছি।

আচার্য। দেখো, সুতসোম, প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা-কিছু পাওয়া যাবে। সেইজন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরও বেড়ে উঠছিল। তার পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি বলে কিছু একটা আছে। আজ গুরু আসবেন শুনে হঠাৎ মনটা থমকে দাঁড়াল—আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল্ মূর্খ কী পেয়েছিস। কিছু না, কিছু না, সুতসোম। আজ দেখছি—এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।

উপাচার্য। ব'লো না, ব'লো না, এমন কথা ব'লো না। আচার্যদেব, আজ কেন হঠাৎ তোমার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হল।

আচার্য। সুতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ।

উপাচার্য। আমার তো একমুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মতো বজ্রের

মতো শক্ত হয়ে জমে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও কিছুই ভাবতে হয় না। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে।

আচার্য। না না, তবে আমি ভুল করছিলুম সূতসোম, ভুল করছিলুম। যা আছে, এই ঠিক এইই ঠিক। যে করেই হ'ক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে।

উপাচার্য। সেইজন্যেই তো অচলায়তন ছেড়ে আমাদের কোথাও বেরোনো নিষেধ। তাতে যে মনের বিক্ষেপ ঘটে—শান্তি চলে যায়।

আচার্য। ঠিক, ঠিক,—ঠিক বলেছ সূতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব। এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখ'নকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি। গুরু, তুমি যখন আসবে, কিছু সরিয়ো না, কিছু আঘাত ক'রো না—চারিদিকেই আমাদের শান্তি, সেই বুঝে পা ফেলো। দয়া ক'রো, দয়া ক'রো আমাদের। আমাদের পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের আর চলবার শক্তি নেই। অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এমনি করেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে—আজ হঠাৎ ব'লো না যে নূতনকে চাই—আমাদের আর সময় নেই।

উপাচার্য। আচার্যদেব, তোমাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখিনি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সূতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র

বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছিনে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত।

আচার্য। আজ আমার একটু একটু মনে পড়ছে বহুপূর্বে সবপ্রথমে সেই ভোরের বেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে যাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম তিনি গুরুই—তিনি পুঁথি নন, শাস্ত্র নন, বৃত্তি নন, তিনি গুরু। তিনি যা ধরিয়ে দিলেন তাই নিয়ে আরম্ভ করলুম—এতদিন মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেইটেই বুঝি আছে, ঠিক চলছে—কিন্তু—

উপাচার্য। ঠিক আছে, ঠিক চলছে, আচার্যদেব, ভয় নেই। প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিইনি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি। তুমি কি বলতে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে। সর্বনাশ। সেই ছায়া!

আচার্য। সর্বনাশই তো।

উপাচার্য। তাহলে হবে কী। এতদিন যারা স্তব্ধ হয়ে আছে তাদের কি আবার উঠতে হবে।

আচার্য। আমি তো তাই সামনে দেখছি। সে কি আমার স্বপ্ন। অথচ আমার তো মনে হচ্ছে এই সমস্তই স্বপ্ন, এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই সব নানা রেখার গণ্ডি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি—সমস্তই স্বপ্ন।

উপাচার্য। ওই যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়। এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল। শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তাকে কিছুতেই

দমন করা গেল না। ওই বালককে আমার ভয় হয়। ওই আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল তোমাকেই মানে। তুমি ওকে একটু ভৎর্সনা করে দিয়ো।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি। উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস, পঞ্চক।

পঞ্চক। করলেন কী। আমাকে ছুঁলেন ?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে।

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারিনি।

আচার্য। কেন পারনি বৎস।

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারিনে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি।

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে-নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।

আচার্য। নিয়মের জন্য ভয় নয়, কিন্তু যে-লোক ভাঙতে যাবে তারই বা দুর্গতি ঘটতে দেব কেন।

পঞ্চক। আমি কোনো তর্ক করব না। আপনি নিজমুখে যদি আদেশ করেন যে, আমাকে সমস্ত নিয়ম পালন করতেই হবে তাহলে পালন করব। আমি আচার-অনুষ্ঠান কিছুই জানিনে, আমি আপনাকেই জানি।

আচার্য। আদেশ করব—তোমাকে? সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

পঞ্চক। কেন আদেশ করবেন না প্রভু।

আচার্য। কেন। বলব বৎস? তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নিচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস।

পঞ্চক। তা জানিনে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে শোণপাংশু জাতির সঙ্গে মেশ।

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান।

আচার্য। না না, থাক্, ব'লো না। কিন্তু শোণপাংশুরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে।

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে—তুমি ভুল করো গে—আমাদের কথা শুনো না। আমাদের গুরু আসছেন পঞ্চক—তাঁর কাছে তোমার মতো বালক হয়ে

যদি বসতে পারি—তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খুলে দেন, তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন আজ থেকে ভুল করে করে সত্য জানবার অধিকার তোমাকে দিলুম, আমার মনের উপর থেকে হাজার দু-হাজার বছরের পুরাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন !

পঞ্চক। ওই উপাচার্য আসছেন—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই। প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি।

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাচার্য। উপাধ্যায় কথাটা বলে ফেলো। এদিকে প্রতিকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গ্রহাচার্য বলছেন আজ তিন প্রহর সাড়ে তিন দণ্ডের মধ্যে দ্ব্যাত্মকচরাংশলগ্নে যা-কিছু করবার সময়—সেটা অতিক্রম করলেই গোপরিক্রমণ আরম্ভ হবে, তখন প্রায়শ্চিত্তের কেবল এক পাদ হবে বিপ্র, অর্ধ পাদ বৈশ্য, বাকি সমস্তটাই শূদ্র।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রঃপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারিনে। আজ তিন-শ বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয়নি—সবাই ভুলেই গেছে। ওই যে মহাপঞ্চক আসছেঁ—যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেই জন্যেই তো এলুম ; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই— তুমিই বলতে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না— একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা যে-অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তাহলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে। সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই।

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন ! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই—সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়। যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এ-রকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখিনি। এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ করনি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়।

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাস সমস্তই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান।

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতনধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল। এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

উপাচার্য। সে কি হয়। যিনি একবার আচার্য হয়েছেন তাঁকে কি আমাদের ইচ্ছামতো—

মহাপঞ্চক। উপাচার্যমশায়, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

উপাচার্য। নূতন কিছুতে যোগ দেবার বয়স আমার নয়।

উপাধ্যায়। আজ বিপদের সময় বয়স-বিচার!

উপাচার্য। ধর্মকে বাঁচাবার জন্যে যা করবার করো। আমাকে দাঁড়াতে হবে আচার্যদেবের পাশে। আমরা একসঙ্গে এসেছিলুম, যদি বিদায় হবার দিন এসে থাকে তবে একসঙ্গেই বাহির হয়ে যাব।

মহাপঞ্চক। কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে দেখবেন। আচার্যদেবের অভাবে আপনারই আচার্য হবার অধিকার।

উপাচার্য। মহাপঞ্চক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এ-কথা বলবার জন্যে তুমি যে মুখ খুলেছ সে কি এখানকার উত্তর দিকের জানলা খোলার চেয়ে কম পাপ।

প্রস্থান

মহাপঞ্চক। চলো উপাধ্যায়, আর বিলম্ব নয়। আচার্য অদীনপুণ্য যতক্ষণ এ আয়তনে থাকবেন ততক্ষণ ক্রিয়াকর্ম সমস্ত বন্ধ, ততক্ষণ আমাদের অশৌচ।

২

পাহাড় মাঠ

পঞ্চকের গান

এ-পথ গেছে কোন্ খানে গো কোনখানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিকপানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশুদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে। তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস।

প্রথম শোণপাংশু। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখতে পারিনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আয় ভাই ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁসনে রে ছুঁসনে।

তৃতীয় শোণপাংশু। ওই রে। ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। শোণপাংশুকে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন ?

প্রথম শোণপাংশু। সত্যি নাকি। তিনি মানুষটি কী রকম। তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে।

পঞ্চক। নতুনও আছে পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা এলে খবর দিয়ো—একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে। সর্বনাশ। তিনি তো শোণপাংশুদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে—তাকে নিয়েই—

তৃতীয় শোণপাংশু। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়। আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ-পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানিনি।

প্রথম শোণপাংশু। সেইজন্যেই তো ও-জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক—তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে ; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী একটা ফল পাবে—তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। কিন্তু শোণপাংশু বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয় সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম শোণপাংশু। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন।

পঞ্চক। বলতে পারিনে—কী জানি যদি আপরাধ নেন। ওরে,

তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস—সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো।

প্রথম শোণপাংশু। চাষ করি বই কি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।

পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়—কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস।

প্রথম শোণপাংশু। করি বই কি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি। খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি।

তৃতীয় শোণপাংশু। কেন করব না। এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায় কিন্তু জানিসনে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিইনে।

প্রথম শোণপাংশু। কেন?

পঞ্চক। কেন কী রে। ওটা যে নিষেধ।

প্রথম শোণপাংশু। কেন নিষেধ।

পঞ্চক। শোনো একবার। নিষেধ, তার আবার কেন। সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ! এই সহজ কথাটা বুঝিসনে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন? ওটা কি তোমরা খাও না।

পঞ্চক। খাই বই কি, খুব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াইনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন।

পঞ্চক। ফের কেন। তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে-খবর রাখিসনে বুঝি।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন।

পঞ্চক। আবার কেন? তোরা যে ওই এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় শোণপাংশু। আর, খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক। একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্ এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এত-বড়ো তেজ। তোরা হলে কী করতিস বল্ দেখি।

প্রথম শোণপাংশু। আমাদের কথা বল কেন। উপবাসের দিনে

খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তাহলে তাকে আরও একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস—তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস।

প্রথম শোণপাংশু। লোহার কাজ করি বই কি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

তৃতীয় শোণপাংশু। আমরা লোহার কাজ করি তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।

গান

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন
ওগো তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।
অচল ছিল সচল হয়ে
ছুটেছে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় একঘর ছাত্রের সামনে বললেন শোণপাংশু জাতটা এমনই বিশ্রী যে তারা নিজের হাতে লোহার কাজ করে।

আমি তাঁকে বললুম, ও বেচারারা পড়াশুনো কিছুই করেনি সে আমি জানি—এমন কি, এই পৃথিবীটা যে ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথামুড়োনো চুলের জটা দিয়ে তৈরি তাও ওই মূর্খেরা জানে না, আবার সে-কথা বলতে গেলে মারতে আসে,—তাই ব'লে ভালোমন্দর জ্ঞান কি ওদের এতটুকুও নেই যে লোহার কাজ নিজের হাতে করবে। আজ তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যার যে-বংশে জন্ম তার সেইরকম বুদ্ধি হয়।

প্রথম শোণপাংশু। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে।

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম শোণপাংশু। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কী—এই বুঝে নে না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। সুতরাং মহাপঞ্চকদাদা ছাড়া আর অতি অল্প লোকেরই জানবার সম্ভাবনা আছে। সাধে মহাপঞ্চকদাদাকে ওখানকার ছাত্রেরা একেবারে পূজা করে। যা হ'ক ভাই তোরা যে আমাকে ক্রমেই আশ্চর্য করে দিলি রে। তোরা তো খেঁসারিডাল চাষ করছিস আবার লোহাও পিটোচ্ছিস, এখনও তোরা কোনো দিক্ থেকে কোনো পাঁচ-চোখ কিংবা সাত-মাথাওআলার কোপে পড়িসনি?

প্রথম শোণপাংশু। যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে তারও কোপ বড়ো কম নয়।

পঞ্চক। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায়নি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র।

পঞ্চক। এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র—তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় শোণপাংশু। ওর মানে কী।

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মরীচি?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী।

তৃতীয় শোণপাংশু। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া-নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় শোণপাংশু। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছিনে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তাহলে তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

শোণপাংশুগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে—আমার সর্বনাশ করলে। আমার আর ভদ্রতা রাখলে না! এদের তালে তালে আমারও পা দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্‌দিন আমিও লোহা পিটব রে লোহা পিটব—কিন্তু খেঁসারির ডাল—না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিসনে পড়ব ব'লে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ও কী পুঁথি দাদা। ওতে কী আছে।

পঞ্চক। এ আমাদের দিক্‌চক্রচন্দ্রিকা—এতে বিস্তর কাজের কথা আছে রে।

প্রথম শোণপাংশু। কী রকম।

পঞ্চক। দশটা দিকের দশ রকম রং গন্ধ আর স্বাদ আছে কিনা এতে তার সমস্ত খোলসা করে লিখেছে। দক্ষিণ দিকের রংটা হচ্ছে রুইমাছের

পেটের মতো, ওর গন্ধটা দধির গন্ধ, স্বাদটা ঈষৎ মিষ্টি ; পুবদিকের রংটা হচ্ছে সবুজ, গন্ধটা মদমত্ত হাতির মতো, স্বাদটা বকুলের ফলের মতো কষা,—নৈঋর্ত কোণের—

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর বলতে হবে না দাদা। কিন্তু দশদিকে তো আমরা এ-সব রং গন্ধ দেখতে পাইনে।

পঞ্চক। দেখতে পেলে তো দেখাই যেত। যে ঘোর মূর্খ সেও দেখত। এ-সব কেবল পুঁথিতে পড়তে পাওয়া যায় জগতে কোথাও দেখবার জো নেই।

প্রথম শোণপাংশু। তাহলে দাদা তুমি পুঁথিই পড়ো, আমরা চললুম।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এদের মতো চোখকান বুজে যদি আমাদের বসে বসে ভাবতে হত তাহলে তো আমরা পাগল হয়ে যেতুম।

তৃতীয় শোণপাংশু। চল্ ভাই ঘুরে আসি, শিকারের সন্ধান পেয়েছি। নদীর ধারে গণ্ডারের পায়ের চিহ্ন দেখা গেছে।

প্রস্থান

পঞ্চক। এই শোণপাংশুগুলো বাইরে থাকে বটে কিন্তু দিনরাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে, বাহিরটাকে দেখতেই পায় না। এরা যেখানে থাকে সেখানে একেবারে অস্থিরতার চোটে চতুর্দিক ঘুলিয়ে যায়। এরা একটু থেমেছে অমনি সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেছে। এই শোণপাংশুদের দেখছি ওরা চুপ করলেই আর কিছু শুনতে পায় না— ওরা নিজের গোলমালটা শোনে সেইজন্যে এত গোল করতে ভালোবাসে। কিন্তু এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্ছে আমার সমস্ত শরীরটা গুন গুন করে বেড়াচ্ছে।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে;
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

শোণপাংশুদলের পুনঃপ্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখন রাখো তোমার পুঁথি রাখো—দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী রে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী চাই রে।

তৃতীয় শোণপাংশু। কিছু চাইনে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে।

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরও জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম শোণপাংশু। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

গান

এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো নানা কাজে
এই তো নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ
দাদাঠাকুর।
সব মিলনে মেলার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো হাসির দলে,
এই তো চোখের জলে,
এই তো সকল ক্ষণের মানুষ
দাদাঠাকুর।

এই তো ঘরে ঘরে,
এই তো বাহির করে,
এই আমাদের কোণের মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মনের মানুষ
দাদাঠাকুর।

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম শোণপাংশু। নিয়ে যাও না। সে তো ভালোই হয়। তাহলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা আয় ভাই আমাদের কাজগুলো সেরে আসি। দাদাঠাকুরকে নিয়ে পঞ্চকদাদা একটু বসুক। প্রস্থান

পঞ্চক। ওই শোণপাংশুগুলো গেছে, এইবার তোমার পায়ের ধুলো নিই দাদাঠাকুর। ওরা দেখলে হেসে অস্থির হত তাই ওদের সামনে করিনে।

দাদাঠাকুর। দরকার কী ভাই পায়ের ধুলোয়।

পঞ্চক। নিতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতরটা যখন ভরে ওঠে, তখন বুঝি তার ভারে মাথা নিচু হয়ে পড়ে—ভক্তি না করে যে বাঁচিনে।

দাদাঠাকুর। ভাই, আমিও থাকতে পারিনে। স্নেহ যখন আমার হৃদয়ে ধরে না, তখন সেই স্নেহই আমার ভক্তি।

পঞ্চক। অচলায়তনে প্রণাম করে করে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। তাতে নিজেকেই কেবল ছোটো করেছি, বড়োকে পাইনি।

দাদাঠাকুর। এই আমার সবার বাড়া বড়োর মধ্যে এসে যখন বসি তখন যা করি তাই প্রণাম হয়ে ওঠে। এই যে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন তোমাকে আশীর্বাদ করছে এও আমার প্রণাম।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, তোমার দুই চোখ দিয়ে এই যে তুমি কেবল সেই বড়োকে দেখছ, তোমাকে যখন দেখি তখন তোমার সেই দেখা-টিকেও আমি যেন পাই। তখন পশুপাখি গাছপালা আমার কাছে আর কিছুই ছোটো থাকে না। এমন কি, তখন ওই শোণপাংশুদের সঙ্গে মাতামাতি করতেও আমার আর বাধে না।

দাদাঠাকুর। আমিও যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই সে-খেলা আমার কাছে মস্ত খেলা। আমার মনে হয় আমি ঝরনার ধারার সঙ্গে খেলছি, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেলছি।

পঞ্চক। তোমার কাছে সবই বড়ো হয়ে গিয়েছে।

দাদাঠাকুর। না ভাই, বড়ো হয়নি, সত্য হয়ে উঠেছে—সত্য যে বড়োই, ছোটোই তো মিথ্যা।

পঞ্চক। তোমার বাধা কেটে গেছে দাদাঠাকুর, সব বাধা কেটে গেছে। এমন হাসতে খেলতে মিলতে মিশতে কাজ করতে কাজ ছাড়তে কে পারে। তোমার ওই ভাব দেখে আমার মনটা ছটফট করতে থাকে। ওই যে কী একটা আছে—চরম, না পরম, না কী তা কে বলবে—তার জন্যে দিনরাত যেন আমার মন কেমন করে। থেকে থেকে এক-একবার চমকে উঠি, আর ভাবি এইবার বুঝি হল, বুঝি পাওয়া গেল। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসবেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কী বিপদ। ভারি উৎপাত করবে তাহলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

দাদাঠাকুর। তোমার যে শিক্ষা কাঁচা রয়েছে, মনে ভয় হচ্ছে না?

পঞ্চক। আমার ভয় সব-চেয়ে কম—আমার একটি ভুলও হবে না।

দাদাঠাকুর। হবে না?

পঞ্চক। একেবারে কিছুই জানিনে, ভুল করবার জায়গাই নেই। নির্ভয়ে চুপ করে থাকব।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাঁকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো।

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যেদিকে হ'ক একদিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয়তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপটা হয়ে যাই।

দাদাঠাকুর। তা, তোমার গুরু তোমার উপর যত পুঁথির চাপই চাপান না কেন তার নিচের থেকে তোমাকে আস্ত টেনে বের করে আনতে পারব।

পঞ্চক। তা তুমি পারবে সে আমি জানি। কিন্তু দেখো ঠাকুর একটা কথা তোমাকে বলি—অচলায়তনের মধ্যে ওই যে আমরা দরজা বন্ধ করে আছি, দিব্যি আছি। ওখানে আমাদের সমস্ত বোঝাপড়া একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার মানুষ সেইজন্যে বড়ো নিশ্চিন্ত। কিছুতে কারও একটু সন্দেহ হবার জো নেই। যদি দৈবাৎ কারও মনে এমন প্রশ্ন ওঠে যে, আচ্ছা ওই যে, চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের

দেওয়ালে তিনবার সাদা ছাগলের দাড়ি বুলিয়ে দিয়ে আওড়াতে হয় "হুন হুন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অমৃতে হুঁফট স্বাহা" এর কারণটা কী—তাহলে কেবলমাত্র চারটে সুপুরি আর এক মাষা সোনা হাতে করে যাও তখনই মহাপঞ্চকদাদার কাছে, এমনি উত্তরটি পাবে যে আর কথা সরবে না। হয় সেটা মানো, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই। তাই সমস্তই চমৎকার সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাকুর সেখান থেকে বের করে তুমি আমাকে এই যে-জায়গাটাতে এনেছ এখানে কোনো মহাপঞ্চকদাদার টিকি দেখবার জো নেই—বাঁধা জবাব পাই কার কাছে। সব কথারই বারো আনা বাকি থেকে যায়। তুমি এমন করে মনটাকে উতলা করে দিলে—তার পর ?

দাদাঠাকুর। তার পরে ?

গান

যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে।
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।

পঞ্চক। এতবড়ো ভরসা তুমি কেমন করে দিচ্ছ ঠাকুর। তুমি কোনো ভয় কোনো ভাবনাই রাখতে দেবে না অথচ জন্মাবধি আমাদের ভয়ের অন্ত নেই। মৃত্যু-ভয়ের জন্যে অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্র পড়ছি, শত্রুভয়ের জন্যে মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী, ঘরের ভয়ের জন্যে গৃহমাতৃকা, বাইরের ভয়ের জন্যে অভয়ংকরী ; সাপের ভয়ের জন্যে মহাময়ূরী, বজ্রভয়ের জন্যে

বজ্রগান্ধারী, ভূতের ভয়ের জন্যে চণ্ডভট্টারিকা, চোরের ভয়ের জন্যে হরাহরহৃদয়া। এমন আর কত নাম করব।

দাদাঠাকুর। আমার বন্ধু এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েছেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষদাঁত ভেঙে যায়।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই বন্ধুকে পেলে কোথা ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। পাবই বলে সাহস করে বুক বাড়িয়ে দিলুম, তাই পেলুম। কোথাও যেতে হয়নি।

পঞ্চক। সে কী রকম।

দাদাঠাকুর। যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনই বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, আলো চাই, ছেলে বলে তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার অচলায়তন ছেড়ে অনেক সাহস করে তোমার কাছ অবধি এসেছি কিন্তু তোমার ওই বন্ধু পর্যন্ত যেতে সাহস করতে পারছিনে।

দাদাঠাকুর। কেন, তোমার ভয় কিসের।

পঞ্চক। খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সব-চেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুর দুর করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে। আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখিনি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

দাদাঠাকুর। তোমরা অনেকগুলো তালা লাগিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে

রাখাকেই মস্ত লাভ মনে কর—কিন্তু সিন্দুকে যে আছে কী তার খোঁজ রাখ না।

পঞ্চক। আমার দাদা বলে, জগতে যা-কিছু আছে সমস্ত:ক দূর করে ফেলতে পারলে তবেই আসল জিনিসটিকে পাওয়া যায়। সেইজন্যেই দিনরাত্রি আমরা কেবল দূরই কবছি—আমাদের কতটা গেল সেই হিসাবটাই আমাদের হিসাব—সে হিসাবের অন্তও পাওয়া যাচ্ছে না।

দাদাঠাকুর। তোমার দাদা তো ওই বলে, কিন্তু আমার দাদা বলে, যখন সমস্ত পাই তখনই আসল জিনিসকে পাই। সেইজন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারিনে—দিনরাত্রি সব খুলে রেখে দিই। আচ্ছা পঞ্চক, তুমি যে তোমাদের আয়তন থেকে বেরিয়ে আস কেউ তা জানে না?

পঞ্চক। আমি জানি যে আমাদের আচার্য জানেন। কোনোদিন তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি--তিনিও জিজ্ঞাসা করেন না আমিও বলিনে। কিন্তু আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি আমাকে দেখলেই বুঝতে পারেন। আমাকে তখন কাছে নিয়ে বসেন, তাঁর চোখের যেন একটা কী ক্ষুধা তিনি আমাকে দেখে মেটান। যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন। ঠাকুর, যেদিন তোমার সঙ্গে আচার্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারব সেদিন আমার অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে।

দাদাঠাকুর। সেদিন আমারও শুভদিন হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমাকে কিন্তু তুমি বড়ো অস্থির করে তুলেছ। এক-একসময় ভয় হয় বুঝি কোনোদিন আর মন শান্ত হবে না।

দাদাঠাকুর। আমিই কি স্থির আছি ভাই। আমার মধ্যে ঢেউ উঠেছে বলেই তোমারও মধ্যে ঢেউ তুলছি।

পঞ্চক। কিন্তু তবে যে তোমার ওই শোণপাংশুরা বলে তোমার কাছে তারা খুব শান্তি পায়, কই শান্তি কোথায়। আমি তো দেখিনে।

দাদাঠাকুর। ওদের যে শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে ওরা শান্তি পায় ?

দাদাঠাকুর। এই পাগল যে পাগলও হয়েছে শান্তিও পেয়েছে। তাই সে কাউকে খ্যাপায় কাউকে বাঁধে। পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে-মন্ত্রে, সেই মন্ত্রেই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

পঞ্চক। ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলছি আমার মন খেপেছে, কেবল জোর পাচ্ছিনে—তাই দাদাঠাকুর মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায়—তুমি জোর দাও—তুমি জোর দাও—তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না।

গান

আমি কারে ডাকি গো
আমার বাঁধন দাও গো টুটে।
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে।
তুমি ডাকো এমনি ডাকে
যেন লজ্জা ভয় না থাকে,
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে।

আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা,
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে ;
ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হল লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায়
পরান কেঁদে উঠে।

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না ? তুমি যাঁর কথা বল তিনি তোমার চোখের জল মুছিয়েছেন ?

দাদাঠাকুর। তিনি চোখের জল মোছান কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

পঞ্চক। কিন্তু দাদা, আমি তোমার ওই শোণপাংশুদের দেখি আর মনে ভাবি ওরা চোখের জল ফেলতে শেখেনি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাও না।

দাদাঠাকুর। যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওদেরও রসের দরকার হবে তখন দূর থেকে বয়ে আনবে। কিন্তু দেখছি ওরা বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, ওই রকমই ওদের স্বভাব।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে ভরে যাবে।

গান

দাদাঠাকুর। বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ।
এবার ধর্ দেখি তোর গান।
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমার বুকের মধ্যে কী আনন্দ যে লাগছে সে আমি বলে উঠতে পারিনে। এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ডাকো ডাকো, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো।

গান

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমনি করে গাও গো।
যেমন করে চাইছে আকাশ
তেমনি করে চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো।

শুনছ দাদা, ওই কাঁসর বাজছে।

দাদাঠাকুর। হাঁ বাজছে।

পঞ্চক। আমার আর থাকবার জো নেই।

দাদাঠাকুর। কেন।

পঞ্চক। আজ আমাদের দীপকেতন পূজা।

দাদাঠাকুর। কী করতে হবে।

পঞ্চক। আজ ডুমুরতলা থেকে মাটি এনে সেইটে পঞ্চগব্য দিয়ে মেখে বিরোচন মন্ত্র পড়তে হবে। তার পরে সেই মাটিতে ছোটো ছোটো মন্দির গড়ে তার উপরে ধ্বজা বসিয়ে দিতে হবে। এমন হাজারটা গড়ে তবে সূর্যাস্তের পরে জলগ্রহণ।

দাদাঠাকুর। ফল কী হবে।

পঞ্চক। প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হয়ে যাবে।

দাদাঠাকুর। যারা ইহলোকে আছে তাদের জন্যে—

পঞ্চক। তাদের জন্যে ঘর এত সহজে তৈরি হয় না। চললুম ঠাকুর, আবার কবে দেখা হবে জানিনে। তোমার এই হাতের স্পর্শ নিয়ে চললুম—এ-ই আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে—এ-ই আমার নাগপাশ-বাঁধন আলগা করে দেবে। ওই আসছে শোণপাংশুর দল—আমরা এখানে বসে আছি দেখে ওদের ভালো লাগছে না, ওরা ছটফট করছে। তোমাকে নিয়ে ওরা হুটোপাটি করতে চায়—করুক, ওরাই ধন্য, ওরা দিনরাত তোমাকে কাছে পায়।

দাদাঠাকুর। হুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়। কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

শোণপাংশুদলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। ও কী ভাই পঞ্চক, যাও কোথায়।

পঞ্চক। আমার সময় হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই হবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। বাঃ সে কি হয়। আজ আমাদের বনভোজন, আজ তোমাকে ছাড়ছিনে।

পঞ্চক। না ভাই, সে হবে না—ওই কাঁসর বাজছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। কিসের কাঁসর বাজছে।

পঞ্চক। তোরা বুঝবিনে। আজ দীপকেতন পূজা—আজ ছেলেমানুষি.না। আমি চললুম। (কিছুদূর গিয়া হঠাৎ ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া)

গান

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে।
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা
যেমন বাঁধনহারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে।
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে।

প্রথম শোণপাংশু। বেশ বেশ পঞ্চকদাদা, তাহলে চলো আমাদের বনভোজনে।

পঞ্চক। বেশ, চলো। (একটু থামিয়া দ্বিধা করিয়া) কিন্তু ভাই ওই বন পর্যন্তই যাব ভোজন পর্যন্ত নয়।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। সে কি হয়। সকলে মিলে ভোজন না করলে আনন্দ কিসের।

পঞ্চক। না রে, তোদের সঙ্গে ওই জায়গাটাতে আনন্দ চলবে না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন চলবে না। চালালেই চলবে।

পঞ্চক। চালালেই চলে এমন কোনো জিনিস আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে পারে না তা জানিস। মারলে চলে না, ঠেললে চলে না, দশটা হাতি জুড়ে দিলে চলে না, আর তুই বলিস কিনা চালালেই চলবে।

তৃতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা ভাই, কাজ কী। তুমি বনেই চলো, আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে হবে না।

পঞ্চক। খুব হবে রে খুব হবে। আজ খেতে বসবই, খাবই,— আজ সকলের সঙ্গে বসেই খাব—আনন্দে আজ ক্রিয়াকল্পতরুর ডালে ডালে আগুন লাগিয়ে দেব—পুড়িয়ে সব ছাই করে ফেলব। দাদাঠাকুর, তুমি ওদের সঙ্গে খাবে না ?

দাদাঠাকুর। আমি রোজই খাই।

পঞ্চক। তবে তুমি আমাকে খেতে বলছ না কেন।

দাদাঠাকুর। আমি কাউকে বলিনে ভাই, নিজে ব'সে যাই।

পঞ্চক। না দাদা, আমার সঙ্গে অমন করলে চলবে না। আমাকে তুমি হুকুম করো তাহলে আমি বেঁচে যাই। আমি নিজের সঙ্গে কেবলই তর্ক করে মরতে পারিনে।

দাদাঠাকুর। অত সহজে তোমাকে বেঁচে যেতে দেব না পঞ্চক। যেদিন তোমার আপনার মধ্যে হুকুম উঠবে সেইদিন আমি হুকুম করব।

একদল শোণপাংশুর প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন।

প্রথম শোণপাংশু। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা ? কেন, মারতে গেল কেন।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক প'ড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শোণপাংশু। আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম শোণপাংশু। কোথায়।

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখনই ?

দাদাঠাকুর। হাঁ, এখনই।

সকলে। ওরে চল্ রে চল্।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম শোণপাংশু। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে, চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার।

দাদাঠাকুর। এই আমাদের বনভোজন।

প্রথম শোণপাংশু। চলো পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর যদিও আমি কোনো কর্মেরই না, তবু ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

পঞ্চক। তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।

দাদাঠাকুর। আয় রে, তবে যাত্রা করি।

৩

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, উপাধ্যায়, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন তাঁর গুরু তাঁকে যে-আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

একটি ছাত্রের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কী হে তৃণাঞ্জন।

তৃণাঞ্জন। আজ দ্বাদশী, আজ আমার লোকেশ্বর ব্রতের পারণের দিন। কিন্তু কী করব, আমাদের আচার্য যে কে তার তো কোনো ঠিক হল না—আমাদের যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হতে বসল এর কী করা যায়।

মহাপঞ্চক। সে তো আমি তোমাদের বলে রেখেছি—এখন আশ্রমে যা-কিছু কাজ হচ্ছে সমস্তই নিষ্ফল হচ্ছে।

উপাধ্যায়। শুধু নিষ্ফল হচ্ছে তা নয়, আমাদের অপরাধ ক্রমেই জমে উঠছে।

সঞ্জীব। এ যে বড়ো সর্বনেশে কথা।

জয়োত্তম। কিন্তু আমাদের গুরু আসবার তো দেরি নেই, এর মধ্যে আর কত অনিষ্টই বা হবে।

সঞ্জীব। আরে রাখো তোমার তর্ক। অনিষ্ট হতে সময় লাগে না। মরার পক্ষে এক মুহূর্তই যথেষ্ট।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী।

অধ্যেতা। তোমরা তো আমাকে বলে এলে সুভদ্রকে মহাতামসে বসাতে—কিন্তু বসায় কার সাধ্য।

মহাপঞ্চক। কেন কী বিঘ্ন ঘটেছে।

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই!

মহাপঞ্চক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দন কুণ্ডে স্নান করিয়ে সবে উঠেছি এমন সময় পঞ্চক এসে তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি! স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন তাই তো সে সাহস পেলে।

তৃণাঞ্জন। আচার্য অদীনপুণ্য!

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী। এতদিন এই আয়তনে আছি কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনিনি। যে স্নাত তাকে তার ব্রত থেকে ছিন্ন করে আনা! আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক না।

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে না হয়— আপনি বলে দিন না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে।

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী? মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তাহলে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

তৃণাঞ্জন। কেন পারব না। আপনি যদি আদেশ করেন তাহলেই—

জয়োত্তম। কিন্তু শাস্ত্রে কি এর—

মহাপঞ্চক। শাস্ত্রে বিধি আছে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর ভাবনা কী।

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, তোমার কিছুই বাধে না, আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর দেরি করেন কেন। এদিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

জয়োত্তম। দেখো তৃণাঞ্জন, আস্তাকুঁড়ের ছাই দিয়ে তোমার এই মুখের গর্তটা ভরিয়ে দিতে হবে। একটু থামো না।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; তার শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে। অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে
তার আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের,
পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম্ বলছি থাম্!

গান

পঞ্চক। ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলিনি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন—ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ রে ও ভাই নাচ্ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্ রে,—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।
তোরে আজ থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না! ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া। ছাত্রগণ তোমরা আত্মবিস্মৃত হ'য়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন সে-কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ ক'রো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস কজন লোকে পারে। ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে।

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত ক'রো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

তৃণাঞ্জন। দেখুন আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে-অন্যায় আজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে-শাস্তি আরম্ভ হল তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেই-জন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

তৃণাঞ্জন। পারবেন না?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তাহলে আর দ্বিধা করা নয়। তৃণাঞ্জন, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার—আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভব। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

তৃণাঞ্জন। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে—তাতে ক্ষতি কী হয়েছে।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও!

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে

এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার—আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

তৃণাঞ্জন। না না, আয় রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর-কারও ভাগ্যে ঘটেনি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিল।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনও কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তাহলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে। কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে—লোক থাকলে যে পাপ হবে!

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ওই প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে। এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য ক'রো না—এসো পঞ্চক ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক। তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্য সকলকেও মারবে। তোমাদের উপাধ্যায়টিও তেমনি হয়েছেন—তাঁরও আর দেখা নেই।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী। এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত।

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ওই যে শোণপাংশুরা।

মহাপঞ্চক। শোণপাংশুরা যদি আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে আমাদের প্রাচীর ভাঙল কেন?

মহাপঞ্চক। শিখাসচ্ছন্দ মহাভৈরব তো আমাদের প্রাচীর রক্ষা করছেন।

রাজা। তিনি অনাচারী শোণপাংশুদের কাছে আপন শিখা নত করলেন! নিশ্চয়ই তোমাদের মন্ত্র-উচ্চারণ অশুদ্ধ হচ্ছে, তোমাদের ক্রিয়াপদ্ধতিতে স্খলন হচ্ছে নইলে এ যে স্বপ্নের অতীত।

মহাপঞ্চক। আপনি সত্যই অনুমান করেছেন মহারাজ।

সঞ্জীব। একজটা দেবীর শাপ তো আর ব্যর্থ হতে পারে না।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ। কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তরদিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই-দিককার জানলা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

তৃণাঞ্জন। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। তবে তো মিথ্যা আমি সৈন্য জড়ো করতে বলে এলুম দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও।

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না, না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি— শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে

প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী রইলেন, এই ব্রহ্মচারীরা সাক্ষী রইলেন।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাহিরে নয়—কী জানি যদি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। আমার পরামর্শ এই যে, আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকদের পাড়া আছে এ-কয়দিন সেইখানে তাঁকে বদ্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজ পতিত জাতি।

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন অনাচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোখ ফুটবে। মনে ক'রো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব—তারও সেইখানে গতি।

রাজা। দেখো মহাপঞ্চক, তোমার উপরই নির্ভর, যুদ্ধে জেতা চাই। আমার হার যদি হয় তবে সে তোমাদের অচলায়তনেরই অক্ষয় কলঙ্ক।

মহাপঞ্চক। কোনো ভয় করবেন না।

৪

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি। কিন্তু এখনও মনটাকে তার খোলসের ভিতর থেকে টেনে বের করতে পারছিনে কেন?

গান

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে।
তোরা আমায় বলে দে ভাই বলে দে রে।
ফুলের গোপন পরানমাঝে
নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।
যে মধুটি লুকিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।

দর্ভকদলের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। দাদাঠাকুর।

পঞ্চক। ও কী ও। দাদাঠাকুর বলছিস কাকে? আমার গায়ে দাদাঠাকুর নাম লেখা হয়ে গেছে নাকি?

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্যে ভাবিসনে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁওয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে তোরা সকালবেলায় করিস কী বল্ তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবিনে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভকজাত—আমরা ওসব কিছুই জানিনে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলা পড়েনি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ। বলিস কী। এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তাহলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল। তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল্ তো।

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানিনে, আমরা নামগান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি—তোরা আমাকেও হাসাবি—শুনেও মন খুশি হয়। আমি যে কী মূল্যের মানুষ সে তোরা খবর পাসনি বলে এখনও আমার হাসিকে ভয় করিস। কিছু ভাবিসনে—নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই আয় তবে--গান ধর্।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।

ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ওই গান শিখিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আমাদের গান ?

পঞ্চক। হাঁ রে, হাঁ ওই অধমের গান, অক্ষমের কান্না। তোদের এই মূর্খের বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খুঁজেই তো আমার পড়াশুনা কিছু হল না, আমার ক্রিয়াকর্ম সমস্ত নিষ্ফল হয়ে গেল ! ও ভাই, আর-একটা শোনা—অনেক দিনকার তৃষ্ণা অল্পে মেটে না।

দর্ভকদলের গান

আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি।
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।
তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যাকালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি।

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। সার্থক হল আমার নির্বাসন।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়েনি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব—সে কি হয়!

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে। প্রস্থান

আচার্য। দেখো পঞ্চক, কাল এখানে এসে আমার ভারি গ্লানি বোধ হচ্ছিল।

পঞ্চক। আমি তো কাল রাত্রে ঘরের বাইরে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

আচার্য। যখন এইরকম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে আদ্যোপান্ত পাপলিপ্ত মনে করে বসে আছি এমন সময় ওরা সন্ধ্যাবেলায় ওদের কাজ থেকে ফিরে এসে সকলে মিলে গান ধরলে—

পারের কাণ্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়?
নামবে কি সব বোঝা এবার ঘুচবে কি সব দায়?

শুনতে শুনতে মনে হল আমার যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল।

দিনের পর দিন কী ভার বয়েই বেড়িয়েছি। কিন্তু কতই সহজ, সরল প্রাণ নিয়ে সেই পারের কাণ্ডারীর খেয়ায় চড়ে বসা।

পঞ্চক। আমি দেখছি দর্ভক জাতের একটা গুণ—ওরা একেবারে স্পষ্ট করে নাম নিতে জানে। আর তট তট তোতয় তোতয় করতে করতে আমার জিবের এমনি দশা হয়েছে যে, সহজ কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। আচার্যদেব, কেবল ভালো করে না ডাকতে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শুকিয়ে এসেছে, একবার খুব করে গলা ছেড়ে ডাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু গলা খোলে না যে—রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে প্রভু। এমন হয়েছে আজ কান্না এলেও বেধে যায়।

আচার্য। সেইজন্যেই তো ভাবছি আমাদের গুরু আসবেন কবে। জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে দিন—হাতে করে ধরে সকলের সঙ্গে মিল করিয়ে দিন।

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ওই পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর-কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে—আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তাহলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনও শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

পঞ্চক। প্রভু, আমরা তাঁকে সকলে মিলে কত কাঁদালুম তবু তাড়াতে পারলুম না। তাঁকে যে-ঘরে বসালুম সে-ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলুম—তাঁকে আর দেখতে পাইনে—তবু তিনি সেখানে বসে আছেন।

গান

সকল জনম ভ'রে
ও মোর দরদিয়া।
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া।
আছ হৃদয়মাঝে,
সেথা কতই ব্যথা বাজে
ওগো এ কি তোমায় সাজে
ও মোর দরদিয়া।
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে
তবু আছ তারি 'পরে
ও মোর দরদিয়া।

সেথা আসন হয়নি পাতা
সেথা মালা হয়নি গাঁথা
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া।

উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। একি সুতসোম। আমার কী সৌভাগ্য। কিন্তু তুমি এখানে এলে যে।

উপাচার্য। আর কোথা যাব বলো? তুমি চলে আসামাত্র অচলায়তন যে কী কঠিন হয়ে উঠল, কী শুকিয়ে গেল সে আমি বলতে পারিনে। এখন এসো একবার কোলাকুলি করি।

আচার্য। আমাকে ছুঁয়ো না—কাল থেকে ঘটশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি কিছুই করিনি।

উপাচার্য। তা হ'ক তা হ'ক। তোমারও আলিঙ্গন যদি অশুচি হয় তবে সেই অশুচিতার পুণ্যদীক্ষাই আমাকে দাও। কোলাকুলি

পঞ্চক। উপাচার্যদেব, অচলায়তনে তোমার কাছে যত অপরাধ করেছি আজ এই দর্ভকপাড়ায় সে-সমস্ত ক্ষমা করে নাও।

উপাচার্য। এসো বৎস, এসো। আলিঙ্গন

আচার্য। সুতসোম, গুরু তো শীঘ্রই আসছেন, এখন তুমি সেখান থেকে চলে এলে কী করে?

উপাচার্য। সেইজন্যেই চলে এলুম। গুরু আসছেন, তুমি নেই! আর মহাপঞ্চক এসে গুরুকে বরণ করে নেবে—এও দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে। ওই শাস্ত্রের কীটটা গুরুকে আহ্বান করে আনবার যোগ্য

এমন কথা যদি স্বয়ং মহামহর্ষি জলধরগর্জিতঘোষ সুস্বরনক্ষত্রশঙ্কুসুস্মিত এসেও বলেন তবু আমি মানতে পারব না।

পঞ্চক। আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল। শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পর বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে।

আচার্য। ওই যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি।

পঞ্চক। মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা—এই যে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।

ডালিতে কেয়াফুল কদম্বফুল লইয়া
বাদ্যসহ দর্ভকদলের প্রবেশ

আচার্য। বাবা, তোমাদের এ কী সমারোহ। আজ এ কী কাণ্ড।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আজ তোমাদের নিয়েই সমারোহ। কখনো পাইনে আজ পেয়েছি।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমরা তো শাস্ত্র কিছুই জানিনে—তোমাদের দেবতা আমাদের ঘরে আসে না।

তৃতীয় দর্ভক। কিন্তু আজ দেবতা কী মনে করে অতিথি হয়ে এই অধমদের ঘরে এসেছেন।

প্রথম দর্ভক। তাই আমাদের যা আছে তাই দিয়ে তোমাদের সেবা করে নেব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের মন্ত্র নেই বলে আমরা শুধু কেবল গান গাই।

মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমালবনে আঁধার করে।
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরানখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার 'পরে।

আচার্য। পঞ্চক, আমাদেরও এমনি করে ডাকতে হবে—বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও—আর দেরি ক'রো না।

ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে বরণ,
করিব জয় শরমত্রাসে
দাঁড়াব আজ তোমার পাশে

বাঁধন বাধা যাবে জ্বলে,
সুখদুঃখ দেব দলে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভরে।

সকলে। উতল ধারা বাদল ঝরে—
দুয়ার খুলে এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

পঞ্চক। ওই আবার বজ্র।

আচার্য। দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি এল।

উপাচার্য। আজ সমস্ত রাত এমনি করেই কাটবে।

৫

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, তৃণাঞ্জন, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন। কোনো ভয় নেই।

তৃণাঞ্জন। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে!

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে-ছেলের মাবাপ ভাইবোন কেউ মরেনি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনও জুটিয়ে আনতে পারলে না—দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছিনে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে। আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখিনি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁক বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ওই যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসবার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কতদূর।

উপাধ্যায়। কতদূর কী। এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনও শাঁক বাজালে না।

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখিনে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছিনে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কী। দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ।

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক।

তৃণাঞ্জন। আমি তো তখনই বলেছিলুম এ-সব কাজ এই কাঁচা-বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়।

বিশ্বম্ভর। কিন্তু এখন করা যায় কী।

তৃণাঞ্জন। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হ'ক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তাহলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে-পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

তৃণাঞ্জন। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিইনে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করিনি।

সঞ্জীব। শুনছ—ওই শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে।

তৃণাঞ্জন। ধরো মহাপঞ্চককে। বাঁধো ওকে। একজটা দেবীর কাছে ওকে বলি দেবে চলো।

মহাপঞ্চক। সেই কথাই ভালো। দেবীর কাছে আমাকে বলি দেবে চলো। তাঁর রোষ শান্তি হবে। এমন নিষ্পাপ বলি তিনি আর পাবেন কোথায়।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী রে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন।

প্রথম বালক। আজ একী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি।

দ্বিতীয় বালক। আজ চারিদিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখিনি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনিনি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা।

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছিনে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তাহলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ ?

মহাপঞ্চক। হাঁ বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজা রে মজা।

দ্বিতীয় বালক। আজ পংক্তিধৌতির দরকার নেই ?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ও রে কী মজা। আঃ আজ চারিদিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠছে বিশ্বম্ভর। এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছিনে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী ভেবে উঠতে পারছিনে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল্ দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি—আমাদের ছুটি।

তৃতীয় বালক। সকাল থেকে পঞ্চকদাদার সেই গানটা কেবলই আমরা গেয়ে বেড়াচ্ছি।

জয়োত্তম। কোন্ গান।

প্রথম বালক। সেই যে—

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা।
নাচে আলো নাচে—ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে—ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে ;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা—ও ভাই
যায় না মানিক গোনা,
পাতায় পাতায় হাসি—ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুরনদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা।

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন।

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু?

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমার আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

তৃণাঞ্জন। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়।

(সকলে স্তম্ভিত)

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু।

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে।

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন।

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে।

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখনি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব।

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারিনে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না— আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি।

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহলে প্রণাম করব বই কি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি ?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা।

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী—এরা শোণপাংশু।

সকলে। শোণপাংশু!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী ?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল!

দাদাঠাকুর। এসো তো, তোমাদের মন্ত্র এদের শুনিয়ে দাও। এদের কর্মকাণ্ড কী রকম তাও ক্রমে দেখতে পাবে।

শোণপাংশুদের গান

যিনি সকল কাজের কাজি মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী।
তাঁরি বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চলে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান ভেরী, মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গি।
এই জন্মমরণ-খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়

এই দুঃখসুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে,
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দলে
সাগরগিরি লঙ্ঘি।

মহাপঞ্চক। আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখন ওই ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম শোণপাংশু। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ—সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই— আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না।

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে।

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে?

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের।

সকলে। কোথায় খেলবে।

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত। এই ঘরের মতো মস্ত?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো। ওই আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো। উঃ কী ভয়ানক।

প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর। কিসের পাপ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

দাদাঠাকুর। না বাছা, খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে?

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ওই বালকদের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এসো না!

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

৬

দর্ভকপল্লী

গান

পঞ্চক। আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।
পালে আমার লাগল হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে।
সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাই রে।
পাগলামি আজ লাগল পাখায়
পাখি কি আর থাকবে শাখায়?
দিকে দিকে সাড়া যে পাই রে।

আচার্যের প্রবেশ

পঞ্চক। দূরে থেকে নানাপ্রকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আচার্যদেব। অচলায়তনে বোধ হয় খুব সমারোহ চলছে।

আচার্য। সময় তো হয়েছে। কালই তো তাঁর আসবার কথা ছিল। আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একবার সুতসোমকে ওখানে পাঠিয়ে দিই।

পঞ্চক। তিনি আজ একাদশীর তর্পণ করবেন বলে কোথায় ইন্দ্রতৃণ পাওয়া যায় সেই খোঁজে বেরিয়েছেন।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের ?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কিসের ? আজ তো গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন ?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারিদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেননি ?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন। সে কী রকম হল ?

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বল্ তো?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল! বল্ বল্ শুনি ঠিক বলছিস তো রে?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, সকলেই তো বলছে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। ওরে কী আনন্দ রে কী আনন্দ।

আচার্য। এ কি পঞ্চক, হঠাৎ তুমি এ রকম উন্মত্ত হয়ে উঠলে কেন?

পঞ্চক। প্রভু, আমার মনের একটা বাসনা ছিল কোনো সুযোগে যদি আমাদের দাদাঠাকুরের সঙ্গে গুরুর মিলন করিয়ে দিতে পারি, তাহলে দেখে নিই কে হারে কে জেতে!

আচার্য। পঞ্চক, তোমার কথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিনে। তুমি দাদাঠাকুর বলছ কাকে?

পঞ্চক। আচার্যদেব, ওইটে আমার গোপন কথা, অনেকদিন থেকেই মনে রেখে দিয়েছি। এখন তোমাকে বলব না প্রভু, যদি তিনি এসে থাকেন তাহলে একেবারে চোখে চোখে মিলিয়ে দেব।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি—দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক। হাঁ, লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে?

পঞ্চক। আমার প্রাণ ডাকছে। একটা কিসের মায়াতে মন জড়িয়ে রয়েছে প্রভু। যেন কেবলই স্বপ্ন দেখছি—আর যতই জোর করছি কিছুতেই জাগতে পারছিনে।' কেবল এমন বসে বসে হবে না দেব।

একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়তে না পারলে কিছুতেই এ ঘোর কাটবে না।

গান

	আর নহে আর নয়।
আমি	করিনে আর ভয়।
আমার	ঘুচল বাঁধন ফলল সাধন
	হল বাঁধন ক্ষয়।
ঐ	আকাশে ঐ ডাকে
আমায়	আর কে ধরে রাখে।
আমি	সকল দুয়ার খুলেছি আজ
	যাব সকলময়।
ওরা	বসে বসে মিছে
শুধু	মায়াজাল গাঁথিছে,
ওরা	কী যে গোনে ঘরের কোণে
	আমায় ডাকে পিছে।
আমার	অস্ত্র হল গড়া,
আমার	বর্ম হল পরা,
এবার	ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে
	করবে ভুবন জয়।

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য। বলিস কী। গুরু? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায় ?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও—আমরা তফাতে সরে যাই।

আর একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়—সে এ পাড়ায় আসবে কেন ? এ যে আমাদের গোঁসাই !

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই ?

প্রথম দর্ভক। হাঁরে হাঁ, আমাদের গোঁসাই। এমন সাজ তার আর কখনো দেখিনি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই সব বের কর্।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গরুর দুধ শিগগির দুয়ে আন্ দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়।

পঞ্চক। এ কী। এ যে দাদাঠাকুর। গুরু কোথায়।

দর্ভকদল। গোঁসাইঠাকুর। প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন। তোমার ভোগ যে তৈরি হয়নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়েনি নাকি। তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস নাকি রে ?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। ওই অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয়নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি তোমাকে জোড়হাত করে বলছি আর আমাকে বসিয়ে রাখার কাজে লাগিয়ো না। তোমার ওই বীরবেশে আমার মন ভুলেছে—তোমাকে এমন মনোহর আর কখনো দেখিনি।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই পঞ্চক। অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝ'ড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। আমি বলছি তুমি অচলায়তনের লোকের সকলের চেয়ে আপন।

পঞ্চক। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমি কেবল একলা, একলা, ওরা আমাকে সবাই ঠেলে রেখে দেবে।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সবচেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তাহলে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো—আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।

পঞ্চক। শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর। হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বসতে শিখুক।

পঞ্চক। ওদের বসিয়ে রাখা! সর্বনাশ। তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছটফট করাকেই মুক্তি মনে করে।

দাদাঠাকুর। ছোটো ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুশি হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেইরকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিস বলে জানে—কিন্তু জানে না স্থির হয়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের করে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্যে তোমার মহাপঞ্চকদাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

পঞ্চক। তাহলে আমার মহাপঞ্চকদাদাকে কি ওইখানেই—

দাদাঠাকুর। হাঁ ওইখানেই বই কি। তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায়নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে-মানুষ নেই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোভভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।

আচার্য। আর এই চির-অপরাধীর কী বিধান করলে প্রভু।

দাদাঠাকুর। তোমাকে আর কাজ করতে হবে না আচার্য। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

আচার্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে—আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাইনে—আমাকে একটু রস দাও।

দাদাঠাকুর। ভাবনা নেই আচার্য ভাবনা নেই—আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে—তার ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক—আজ দুর্যোগ একে বলে কে। আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না—আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু।

দাদাঠাকুর। কী বাবা।

সুভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই ?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী ! উত্তরেব দিকের দেয়ালটা ভাঙবা-মাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে, সে আর কোনোদিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো—তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব ?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজাজানলাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

উপাচার্য। (প্রবেশ করিয়া) তৃণ পাওয়া গেল না—কোথাও তৃণ পাওয়া গেল না।

আচার্য। সূতসোম, তুমি বুঝি তৃণ খুঁজেই বেড়াচ্ছিলে ?

উপাচার্য। হাঁ, ইন্দ্রতৃণ, সে তো কোথাও পাওয়া গেল না। হায় হায়। এখন আমি করি কী। এমন জায়গাতেও মানুষ বাস করে !

আচার্য। থাক্ তোমার তৃণ। এদিকে একবার চেয়ে দেখো।

উপাচার্য। এ কী। এ যে আমাদের গুরু। এখানে ! এই দর্ভকদের পাড়ায় ! এখন উপায় কী। ওঁকে কোথায়—

দর্ভকগণের অর্ঘ্য লইয়া প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। গোঁসাই, এই সব তোমার জন্যে এনেছি। কেতনের মাসি পরশু পিঠে তৈরি করেছিল তারি কিছু বাকি আছে—

উপাচার্য। আরে, আরে সর্বনাশ করলে রে। করিস কী। উনি যে আমাদের গুরু।

দ্বিতীয় দর্ভক। তোমাদের গুরু আবার কোথায়। এ তো আমাদের গোঁসাই।

দাদাঠাকুর। দে ভাই, আর কিছু এনেছিস?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ জাম এনেছি।

তৃতীয় দর্ভক। কিছু দই এনেছি।

দাদাঠাকুর। সব এখানে রাখ্‌। এসো ভাই পঞ্চক, এসো আচার্য অদীনপুণ্য—নূতন আচার্য আর পুরাতন আচার্য এসো, এদের ভক্তির উপহার ভাগ করে নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি।

বালকগণের প্রবেশ

সকলে। গুরু।

দাদাঠাকুর। এসো বাছা, তোমরা এসো।

প্রথম বালক। কখন আমরা বের হব?

দাদাঠাকুর। আর দেরি নেই—এখনই বের হতে হবে।

দ্বিতীয় বালক। এখন কী করব।

দাদাঠাকুর। এই যে তোমাদের ভোগ তৈরি হয়েছে।

প্রথম বালক। ও ভাই এই যে জাম—কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। ওরে ভাই খেজুর—কী মজা।

তৃতীয় বালক। গুরু, এতে কোনো পাপ নেই?

দাদাঠাকুর। কিছু না—পুণ্য আছে।

প্রথম বালক। সকলের সঙ্গে এইখানে বসে খাব?

দাদাঠাকুর। হাঁ এইখানেই।

শোণপাংশুদলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর তো পারিনে। দেয়াল তো একটাও বাকি রাখিনি। এখন কী করব। বসে বসে পা ধরে গেল যে।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই রে। শুধু শুধু বসিয়ে রাখব না। তোদের কাজ দেব।

সকলে। কী কাজ দেবে?

দাদাঠাকুর। আমাদের পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।

সকলে। বেশ, বেশ, রাজি আছি।

দাদাঠাকুর। ওই ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।

সকলে। হাঁ মিলেছে।

দাদাঠাকুর। সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুইদলে লাগো তোমাদের কাজে।

সকলে। তাই লাগব। পঞ্চকদাদা, তাহলে তোমাকে উঠতে

হচ্ছে, অমন করে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। ত্বরা করো। আর দেবি না।

পঞ্চক। প্রস্তুত আছি। গুরু তবে প্রণাম করি। আচার্যদেব আশীর্বাদ করো।

গ্রন্থপরিচয়

অচলায়তন ১৩১৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অচলায়তন ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রবাসীতে নাটকটি প্রকাশিত হইলে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্য্যাবর্ত্ত' মাসিক পত্রে (কার্তিক ১৩১৮) ইহার একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন, ইহাতে নাটকটির প্রশস্তি ও তিরস্কার দুইই ছিল। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার উত্তর দেন, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।—

নিজের লেখা সম্বন্ধে কোনোপ্রকার ওকালতি করিতে যাওয়া ভদ্ররীতি নহে। সে রীতি আমি সাধারণত মানিয়া থাকি। কিন্তু আপনার মতো বিচারক যখন আমার কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করেন, তখন প্রথার খাতিরে ঔদাসীন্যের ভান করা আমার দ্বারা হইয়া উঠে না।

সাহিত্যের দিক দিয়া আপনি অচলায়তনের উপর যে রায় লিখিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমি কোনো আপিল রুজ্ করিব না। আপনি যে ডিক্রী দিয়াছেন সে আমার যথেষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু ওই যে একটা উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া আমার উপরে একটা মস্ত অপরাধ চাপাইয়াছেন সেটা আমি চুপচাপ করিয়া মানিয়া লইতে পারিব না। কেবলমাত্র ঝোঁক দিয়া পড়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ দুই-তিন-রকম হইতে পারে। কোনো কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্যটা সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক তাহাও কোনো কোনো স্থলে ঝোঁকের দ্বারা সংশয়াপন্ন হইতে পারে। পাখি পিঞ্জরের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে ইহা কাব্যের কথা— কিন্তু পিঞ্জরের নিন্দা করিয়া খাঁচাওআলার প্রতি খোঁচা দেওয়া হইতেছে এমনভাবে সুর করিয়াও হয়তো পড়া যাইতে

পারে। মুক্তির জন্য পাখির কাতরতাকে ব্যক্ত করিতে হইলে খাঁচার কথাটা একেবারেই বাদ দিলে চলে না। পাখির বেদনাকে সত্য করিয়া দেখাইতে হইলে খাঁচার বদ্ধতা ও কঠিনতাকে পরিস্ফুট করিতেই হয়। জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়— এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য। সেই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয়— এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে।

ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য গতি দিবার জন্যই আচারের সৃষ্টি— কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেইসমস্ত আচারকে নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড়ো হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম যখন সচল নদীর মতো আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মতো পড়িয়া থাকে— বস্তুত তখন তাহা তপ্ত মরুভূমি, তৃষাহরা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সন্ধান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায় তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসিত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না, পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয়?

আপনি যাহা বলিয়াছেন সে কথা সত্য। সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাসবশত মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে— তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয় কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না— এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহাব অশ্রদ্ধা জন্মে—

এ কথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনামাত্র।

এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ-না-কেহ শুনাইয়াছে যে, আচারই ধর্ম নহে ; বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না, এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে তাহা বন্ধন। অভ্যাসের প্রতি আসক্ত মানুষ কোনোদিন এ কথা শুনিয়া খুশি হয় নাই এবং যে এমন কথা বলে তাহাকে পুরস্কৃত করে নাই— কিন্তু ভালো লাগুক আর না লাগুক এ কথা তাহাকে বারংবার শুনিতেই হইবে।

প্রত্যেক মানুষের একটা অহং আছে— সেই অহং-এর আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধকমাত্রের একটা ব্যগ্রতা আছে। তাহার কারণ কী? তাহার কারণ এই, মানুষের নিজের বিশেষত্ব যখন তাহার আপনাকেই ব্যক্ত করিতে থাকে, আপনার চেয়ে বড়োকে নহে, তখন সে আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। আপনার অহংকার, আপনার স্বার্থ, আপনার সমস্ত রাগদ্বেষকে ভেদ করিয়া ভক্ত যখন আপনার সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে ভগবানের ইচ্ছাকে ও তাঁহার আনন্দকেই প্রকাশ করিতে থাকেন তখনই তাঁহার মানবজীবন সার্থক হয়।

ধর্মসমাজেরও সেইরূপ একটা অহং আছে। তাহার অনেক রীতি-পদ্ধতি নিজেকেই চরমরূপে প্রকাশ করিতে থাকে। চিরন্তনকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অহংকারকেই সে জয়ী করে। তখন তাহাকে পরাভূত করিতে না পারিলে সত্যধর্ম পীড়িত হয়। সেই পীড়া যে সাধক অনুভব করিয়াছে সে এমন গুরুকে খোঁজে যিনি এই সমস্ত সামাজিক অহংকে অপসারিত করিয়া ধর্মের মুক্ত স্বরূপকে দেখাইয়া দিবেন। মানবসমাজে যখনই কোনো গুরু আসিয়াছেন তিনি এই কাজই করিয়াছেন।

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, উপায় কী? 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি'

লইয়াই কি মানুষের পেট ভরিবে? অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানের বাধা দূর করিলেই কি মানুষ কৃতার্থ হইবে? তাই যদি হইবে তবে ইতিহাসে কোথাও তাহার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না কেন?

কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কি অচলায়তনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইয়াছে? অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই— না, তা যাইতে পারিবে না— যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে? গুরুর আঘাত, নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। মানুষের স্থূল দেহ যখন মানুষের মনকে অভিভূত করে তখন সেই দেহগত রিপুকে আমরা নিন্দা করি, কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয় প্রেতত্ব-লাভই মানুষের পূর্ণতা? স্থূল দেহের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই দেহ মানুষের উচ্চতর সত্তার বিরোধী হইবে না, তাহার অনুগত হইবে এ কথা বলার দ্বারা দেহকে নষ্ট কবিতে বলা হয় না।

অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে এ কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না— যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই-যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।

কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে

পারে? কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না, তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে; তখন, চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মন্ত্রই যখন মননের স্থান অধিকার করিয়া বসে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুষ্ক জিনিস আর কী হইতে পারে? যেখানে মন্ত্রের এরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের দুর্গতি আছেই। সেই সমস্ত কৃত্রিম বন্ধনজাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার করিয়া ভক্তির সজীবতা ও সরসতা-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে— ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র যখনই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মানুষের মনকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরে তখনই তো মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন— তিনি বলেন, পাথরের টুকরা দিয়া রুটির টুকরার কাজ চালানো যায় না, বাহ্য অনুষ্ঠানকে দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা কেহই বলে না যে, মন্ত্র যেখানে মননের সহায়, বাহিরের অনুষ্ঠান যেখানে অন্তরের ভাবস্ফূর্তির অনুগত, সেখানে তাহা নিন্দনীয়। ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেননা সে যতদিনই বাঁচিবে ততদিনই কেবলই মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেকে

প্রবল করিতে চাহিবে সেইখানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। কেননা, ভাব যে রূপকে টানিয়া আনে সে যে প্রেমের টান, আনন্দের টান— রূপ যখন সেই ভাবকে চাপা দেয় তখন সে সেই প্রেমকে আঘাত করে, আনন্দকে আচ্ছন্ন করে— সেইজন্য যাহারা ভাবের ভক্ত তাহারা রূপের এইরূপ ভ্রষ্টাচার একেবারে সহিতে পারে না। কিন্তু রূপে তাহাদের পরমানন্দ যখন ভাবের সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন দেখে। কিন্তু শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন— যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্তবালু-বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। এ কথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে— ইহা সকল দেশেই সকল মানুষেরই কথা। অবশ্য এই সার্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীয় রূপ ধারণ করিয়াছে— তাহা যদি না করিত তবে উহা অপাঠ্য হইত।

মনে করিয়াছিলাম সংক্ষেপে বলিব— কিন্তু 'নিজের কথা পাঁচ কাহন' হইয়া পড়ে— বিশেষত শ্রোতা যদি সহৃদয় ও ক্ষমাপরায়ণ হন। ইতিপূর্বেও আপনার প্রতি জুলুম করিয়া সাহস বাড়িয়া গেছে— এবারেও প্রশ্রয় পাইব এ ভরসা মনে আছে। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১৮, শান্তিনিকেতন।

আর্যাবর্তের যে সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হয় সেই সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফোয়ারা'

গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে, পূর্বসংখ্যা আর্যাবর্তে প্রকাশিত তাঁহার অচলায়তন আলোচনার ও রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্রের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লেখেন—

আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম— আমি শীতল-ভোগের বরাদ্দ আশাও করি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা। অবস্থাবিশেষে ক্রোধের উত্তেজনাই সত্যকে স্বীকার করিবার প্রথম লক্ষণ, এবং বিরোধই সত্যকে গ্রহণ করিবার আরম্ভ। যদি কেহ এমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন যে, জগতের মধ্যে কেবল আমাদের দেশেই ধর্মে ও সমাজে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা ও বিকৃতি নাই, অথচ বাহিরে দুর্গতি আছে, তবে সত্যের সংঘাত তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে না, তিনি সত্যকে আপনার শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন। তাঁহাদের মন রক্ষা করিয়া যে চলিবে, হয় তাহাকে মূঢ় নয় তাহাকে ভীরু হইতে হইবে। নিজের দেশেব আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাকেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে— সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এ দেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে— সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না,

মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না। সেই কান্নাই নানা নাম ধরিয়া আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার করিয়াছে, সমস্ত দেশকে নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছে এবং বাহিরের সকল আঘাতের সম্বন্ধেই তাহাকে এমন একান্তভাবে অসহায় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না? কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব? অন্তরে যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র— অন্তরের সেই পাপগুলাকে কেবলই 'বাপু বাছা' বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিকলটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে— যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে আর যত মমতা ঐ পাপের প্রতি? তবে কি এই কথাই সত্য যে, আমাদের কোথাও পাপ নাই, আমরা বিধাতার অন্যায় বহন করিতেছি? যদি তাহা সত্য না হয়, যদি পাপ থাকে, তবে সে পাপের বেদনা আমাদের সাহিত্যে কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? আমরা কেবলই আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি যে সমস্ত অপরাধ বাহিরের দিকেই, আপনার মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সেদিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি, আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দিশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্টনাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই— এই পাষাণপ্রাচীরের চারিদিকেই তাহার মাথা ঠেকিয়া সে কোনো আশার পথ দেখিতেছে না— বাস্ রে! এমন নীরন্ধ্র বেষ্টন! এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথনি! বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু

শ্রেয় আছে কি? চারিদিকে তাকাইয়া শ্রেয় কোন্‌খানে দেখা যাইতেছে জিজ্ঞাসা করি! ঘরে বাইরে কোথায় সে আছে? অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে। ইতিহাসে সর্বত্রই কৃত্রিমতার জাল যখন জটিলতম দৃঢ়তম হইয়াছে তখনই গুরু আসিয়া তাহা ছেদন করিয়াছেন—আমাদেরও গুরু আসিতেছেন—দ্বার রুদ্ধ, পথ দুর্গম, বেড়া বিস্তর, তবু তিনি আসিতেছেন—তাঁহাকে আমরা স্বীকার করিব না, বাধা দিব, মারিব, তবু তিনি আসিতেছেন ইহা নিশ্চিত। দোহাই আপনাদের, মনে করিবেন না, অচলায়তনে আমি গালি দিয়াছি বা উপদেশ দিয়াছি—আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি—সে শিকল আমার, এবং সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে—বাজিবে না তো কী? শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়া হউক জানাইতেই হইবে—যে নিজে অনুভব করিতেছে সে অনুভব না করাইয়া বাঁচিবে কী করিয়া? ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিব না—গালিকেই আমার চেষ্টার সার্থকতা মনে করিয়া আমি মাথায় করিয়া লইব—আর কোনো পুরস্কার চাই না। ইতি ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৮

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদধৃত চিঠিপত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহপূর্বক এগুলি বিশ্বভারতীকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

অধ্যাপক এড্‌ওআর্ড টমসন তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, অচলায়তনে কোনো কোনো ইংরেজি গ্রন্থের ছায়া আছে।[১] রামানন্দ

১ Its fable was probably suggested by *The Princess* and more remotely, *The castle of Indolence* and *The Faerie Queen*.— Edward Thompson in *Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist*, p. 225

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ (৩ আষাঢ় ১৩৩৪) এ সম্বন্ধে লেখেন—

Castle of Indolence এবং Faerie Queen আমি পড়িনি—Princessএর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই—আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে।

STATE CENTRAL LIBRAR
WEST BENG
CALCUTT

অচলায়তন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ ১৩১৮

পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৩৪, আষাঢ় ১৩৪৬,

পৌষ ১৩৫৬

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপে
এই অচলায়তন নাটকখানি
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্নাথ সরকার মহাশয়ের নামে
উৎসর্গ করিলাম

১৫ আষাঢ় ১৩১৮
শিলাইদহ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর